শিক্ষাঙ্গন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাব ও রাজনীতি: আমাদের কাল ও একাল

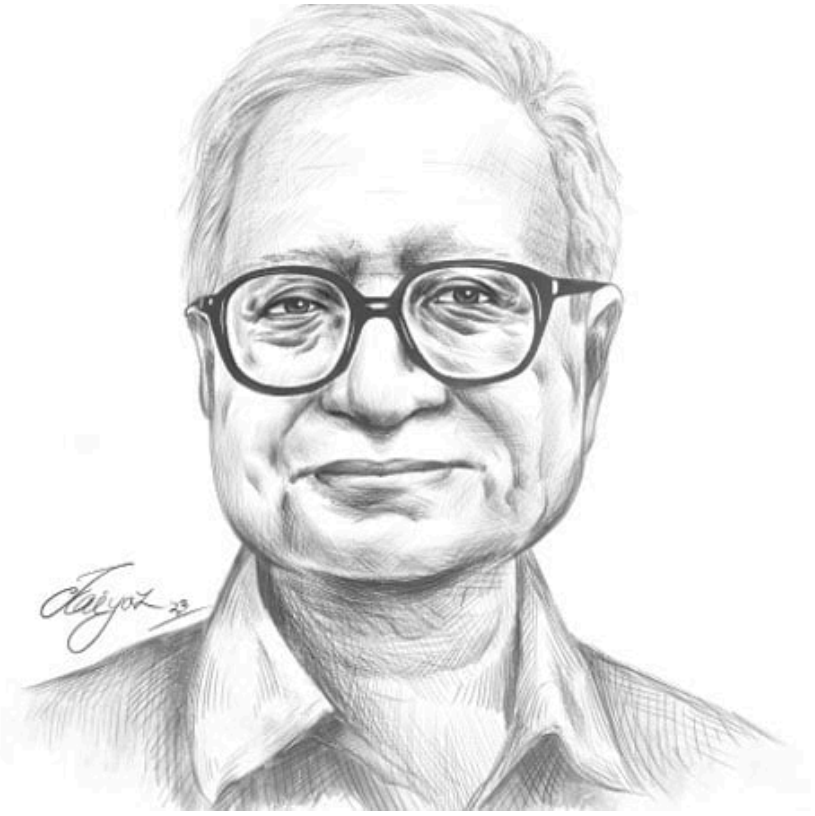

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

প্রকাশ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৬:০৬ | আপডেট: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৬:০৬

- অ +

পাকিস্তান রাষ্ট্রে আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রবাহের তপ্ত হাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে সদস্যদের উপস্থিতি ও আলাপ-আলোচনায় সরাসরি প্রভাব ফেলত। আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যখন ফাতেমা জিন্নাহর সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল তখন প্রতিদিন আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল বিরোধীদলীয় প্রার্থীর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে। ক্লাবে তখন টেলিভিশন

এসে গেছে। মনোযোগ দিয়ে আমরা খবর শুনতাম। যদিও তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রীদেরই কেবল ভোটাধিকার ছিল, আমাদের আশা ছিল অন্তত পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খানের হার হবে। ফল ঘোষণার দিন, তাই, আমরা উদ্বিগ্ন পরীক্ষার্থীর মতো ক্লাবে বসে আছি, টেলিভিশনের সামনে। তবে ফল ঘোষণা যত এগিয়েছে আমাদের উদ্বেগ তত বিষন্নতায় পরিণত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানেও ফাতেমা জিন্নাহ হেরে গেলে চোখেমুখে আমাদের হতাশাটি ছিল দেখবার মতো।

আমার শিক্ষক ড. খান সারওয়ার মুরশিদ তখন রোজই ক্লাবে আসতেন, সেদিনও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বক্তব্যটি এখনও মনে পড়ে। বলেছিলেন- আকাশে উড়ছিলাম, একেবারে পাতালে পড়ে গেলাম। ওটি ছিল সে-সময়ে ক্লাবে উপস্থিত সকলেরই অনুভূতি।

ওই হতাশা কাটতে সময় লেগেছে। পঁয়ষট্টির যুদ্ধের পরপরই আমি ইংল্যান্ডে যাই উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে। আটষট্টির জুলাই মাসে দেশে ফিরে ক্লাবে গেছি, অনেকের সঙ্গে দেখা, দু-একজন বন্ধু এসেছেন ফিরেছি শুনে দেখা করবার জন্য। পরিবেশটি মনে হলো আগের চেয়েও বিষন্নতায় আক্রান্ত। কেউ কোনো আলোর সন্ধান দিতে পারছেন না। কেউ কেউ দেখলাম বৈষয়িক বিষয়ে আলাপ করছেন। বিলেত থেকে আমি একটি গাড়ি এনেছি কিনা জানতে চাইলেন একাধিক হিতৈষী। আনিনি, শুনে আমার অবিবেচনায় হতাশই হলেন। দেশে তখন আইয়ুব খানের উন্নয়নমূলক উদযাপনের অত্যুৎসাহী উদযোগ চলছে। তার মধ্যেও কাউকে কাউকে পাওয়া গেল যারা আশা ছাড়েননি, আগের মতোই আছেন। সেই সময়েই টের পাওয়া গেল বাইরে রাজনৈতিক অসন্তোষ বাড়ছে, এবং আরও বাড়বে এমন ভরসা করা সম্ভব হচ্ছে। তখন ক্লাবে আমরা যারা সমমনা তারা মিলিত হই। আলাপ করি, কী করা যায়। ওইসব কথাবার্তার ভেতর থেকেই সিদ্ধান্ত বের হয়ে এলো যে, প্রশাসনপন্থিদের জবরদখল হটিয়ে দিয়ে শিক্ষক সমিতিকে চাঙ্গা করা দরকার। আমরা ঠিক করলাম সমিতির নির্বাচনে অংশ নেব। প্রফেসর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহকে রাজি করানো গেল সভাপতি হতে। নির্বাচনে তেমন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো না। আমরা সবাই জিতলাম। এই বিজয়ের ফলে মনে হলো, ক্লাবে পরিবেশটি বদলে গেছে।

আইয়ুব খান অতিনিকৃষ্ট একটি কালো আইন চালু করে বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। শিক্ষক সমিতি থেকে আমাদের দাবি ছিল এই আইন বাতিল করার। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ওই দাবি উঠেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও তখন এ দাবিতে সরব হয়ে উঠেছে। আইয়ুববিরোধী আন্দোলন তখন ধীরে ধীরে চাঙ্গা হয়ে উঠছে। ছাত্ররা স্বৈরশাসনবিরোধী যে ১১ দফা দেয়, তাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কালো আইন বাতিলের দাবি ছিল।

মনে হচ্ছিল, গুমোট কেটে যাচ্ছে; সামনে একটি ঝড়ের পালা। ১৯৬৯-এর শুরুর দিকেই অনেক ঘটনা ঘটে। সামরিক বাহিনীর হাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা শহীদ হলেন। এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। জোহা শহীদ হন ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখে। পরের দিন ক্লাবে শিক্ষক সমিতির প্রতিবাদ সভা ডেকে দিবসটিকে আমরা শিক্ষক দিবস হিসেবে ঘোষণা করি। আমি তখন সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমরা রাজপথে মিছিল করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মিছিল করা বোধ করি ওই প্রথম। ড. হবিবুল্লাহর নেতৃত্বে আমরা নতুন গভর্নর এ.কে.এম. আহসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি প্রদান করি। আমরা, পূর্ববঙ্গের সবক'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বড় একটি সভায় মিলিত হয়েছিলাম। স্থান ছিল ক্লাবের হলঘর। মনে পড়ে, সে-সভায় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আমি একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। ক্লাব তখন অত্যন্ত প্রাণবন্ত, সারাদেশের মতোই।

একাত্তরে ২৫ মার্চের আগ পর্যন্ত প্রতিদিন একবার না একবার আমরা ক্লাবে মিলিত হতাম। কী ঘটতে যাচ্ছে এবং আমাদের কী করণীয় তা নিয়ে সরবে কথাবার্তা চলত। বিদেশে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য চিঠির খসড়া আমরা ওইখানে বসেই তৈরি করতাম। ক্লাবের একটি কামরা শিক্ষক সমিতিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল কার্যালয় হিসেবে ব্যবহারের জন্য।

২৫ মার্চ রাতে আমরা ক্লাব থেকে বাসায় চলে যাই ৮টার পরে। টেলিভিশনের সংবাদে বোঝা গেল– মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি এবং আওয়ামী লীগ ২৭ তারিখে হরতাল ডেকেছে। ওদিকে তখনকার ইকবাল হল থেকে কয়েকজন ব্যস্তসমস্ত ছাত্র এসে জানাল যে, রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করা হচ্ছে। সামরিক বাহিনী হামলা করবে বলে তাদের আশঙ্কা। আমরা বিষন্ন মনে যার যার ঘরে ফিরলাম। তারপর মধ্যরাত্রে সেই অবিশ্বাস্য গণহত্যার সূত্রপাত। হানাদারেরা ছাত্রাবাস ও শিক্ষকদের আবাসে তো তাদের নৃশংসতার প্রমাণ দিয়েছেই; ক্লাবকেও বাদ দেয়নি। সেখানেও ঢুকেছে, যাকে পায় হত্যা করবে বলে। সবাই চলে গিয়েছিল, বেয়ারাদের ভেতর চারজন যেতে পারেনি। সে-রাতে ক্লাব ভবনেই তারা প্রাণ হারিয়েছে।

আগস্ট মাসে আমাদের পাঁচজন সহকর্মীকে তারা তাদের বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে চারজন– আবুল খায়ের, রফিকুল ইসলাম, কে.এ.এম. সা'দউদ্দীন ও এ.এন.এম. শহীদুল্লা ছিলেন পরপর ক্লাবের সম্পাদক; আর আহসানুল হক ছিলেন শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক। বোঝা যায়, ক্লাব ও সমিতিকে হানাদারেরা একই চোখে দেখত। ক্লাবে অনুষ্ঠিত সভায় শিক্ষকরা কে কী বলতেন সে-বিষয়েও তারা অবগত ছিল; বন্দি শিক্ষকদের তারা শিক্ষকদের সভার ছবি পর্যন্ত দেখিয়েছে। বোঝা গেছে, ক্লাবে গুপ্তচরদের বিলক্ষণ আনাগোনা ছিল।

হানাদারদের আত্মসমর্পণের দুই দিন পর আবার আমরা ক্লাবে ঢুকি। আমাদের মন ভারাক্রান্ত ছিল ১৪ ডিসেম্বর আলবদরদের নৃশংসতায় শহীদ হওয়া সহকর্মীদের হারানোর ব্যথায়। ক্লাবে ঢুকে হল কামরার কার্পেটে দেখলাম রক্তের ছাপ।

ক্লাবের সঙ্গে এখন আমার আগের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু ক্লাব যে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অপরিহার্য অংশ, সে-নিয়ে কোনো সংশয় নেই। এখন ক্লাবও হয়তো ঠিক আগের মতো নেই; তেমন কথা অবশ্য পুরাতনেরা সব সময়েই বলে থাকে নতুনের সম্বন্ধে। ক্লাব নিশ্চয়ই নতুন সময়ের নতুন রকমের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় যেমন রাজনীতিবহির্ভূত কোনো সত্তা নয়, তেমনি শিক্ষক সমিতি ও ক্লাবও রাজনীতিবিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, যতই 'রাজনীতিমুক্ত' ক্যাম্পাসের কথা বলা হোক।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়